OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 459 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 459 - 467
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

পরাধীন ভারতে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের উন্নয়নে বিদেশী পৃষ্ঠপোষকতা

ড. প্রভাত চৌধুরী
Email ID: pcmusl_rs@caluniv.ac.in

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Krishnanagar, Clay Art of Bengal, Foreign Patronage, Colonial India, British Patronage, Nadia District, Ghurni, Terracotta and Clay Art, International Exhibitions, Artisan Community.

Abstract
Clay craft has been a continuous tradition in the evolution of human culture in the Indian subcontinent since ancient times. One of the important branches of this long-standing tradition is the 'Krishnanagar Clay Craft'. Geographically, Krishnanagar is the headquarters of Nadia district, situated in the border region of India and Bangladesh. During the reign of Maharaja Krishnachandra, some clay artisans migrated from Natore in present day Bangladesh to Ghurni in Krishnanagar. Subsequently, the clay craft of Krishnanagar developed under the patronage of the Zamindars of Nadiaand the British administrators. British administrators and art enthusiasts were particularly Impressed by the realistic and object-oriented style of the artisans of Krishnanagar. With their active patronage, Krishnanagar clay craft began to be displayed at various international exhibitions in Europe. The artisans received considerable appreciation, honour, and fame for their clay works, along with various certificates of merit, medals and other recognitions. Therefore, it may be argued that foreign patronage played a particularly significant role in establishing the worldwide reputation of Krishnanagar clay craft during colonial India.

Discussion

মৃৎশিল্প ও তার বিস্তার : প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ অবধি মানুষের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ক্রমাগত ঘটেই চলেছে। মানবসমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে এক প্রাকৃতিক উপাদান মাটি। নব্যপ্রস্তর যুগে মৃৎপাত্রের প্রচলন ও তার উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই যুগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল কুমোরের চাকা। পঞ্চম সহস্রাব্দে নব্যপ্রস্তর যুগের প্রাচীনকেন্দ্র মেহেরগড়ে মৃৎপাত্র ছাড়াও কিছু ক্ষুদ্রাকৃতি মাটি দিয়ে গড়া মানুষের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নব্যপ্রস্তর যুগে মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছিল বলা যায় (রায়চৌধুরী, ২০০৮)। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু উপত্যকা বাসীরাও সিন্ধু নদের ধারে বসে যে মাটির কাজ করত, বাংলার গ্রামে-গঞ্জে নদী কিংবা পুকুর পাড়ে বাঙালী কুমোর তথা গ্রামীণ ব্রতধর্মী নারী

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 459 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সেই ধারা আজও বহন করে চলেছে (রায়, ১৩৫৬)। সিন্ধু সভ্যতায় বহু মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায় (চট্টোপাধ্যায়, ২০০৪)। 'ঋকবেদ'-এ মৃৎপাত্রের উল্লেখ আছে। 'যজুর্বেদ'-এ 'কুলাল' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, যার অর্থ মৃৎশিল্পের কারিগর বা কুম্ভকার সম্প্রদায়। বল্লাল সেন তাঁর প্রজাদের প্রীতিলাভের জন্য মৃৎশিল্পের সঙ্গে যুক্ত কুম্ভকারসহ অন্য জাতিদের নিয়ে নবশাখ সৃষ্টি করেছিলেন (সেন, ১৪০৫)। বৌদ্ধ সাহিত্য জাতক (গৌতম বুদ্ধের পূর্ব জন্মের কাহিনী) কথামালা থেকেও প্রাচীন ভারতের মৃৎশিল্পের কথা জানা যায় (ঘোষ, ২০০২)। এই সময় মানুষ তার নিজ প্রয়োজনে মাটি দিয়ে বিভিন্ন পাত্র গড়ে তা ব্যবহার করেছে, নান্দনিক চেতনা থেকে সেগুলি রঙিন করে সুন্দর করে গড়েছে। প্রকৃতিকে ভয় পেয়ে মাটি দিয়ে বিভিন্ন মূর্তি গড়ে সেগুলির পুজো করেছে, যেমন মাতৃ মূর্তির কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। মানুষ তার শিল্পবোধ ও অবসর বিনোদনের জন্য হাতে টেপা মাটির পুতুল থেকে নিখুঁত ও সুন্দর পুতুল গড়তে শিখেছে। এভাবে ধীরে ধীরে মাটির কাজ ক্রমশ ব্যবহারিক দ্রব্যাদি থেকে শৈল্পিক দিকে রূপান্তরিত হয়েছে। বহু হাজার বছর আগে মানুষ যখন প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ মাটি থেকে নিজ বুদ্ধির প্রয়োগ করে বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন করে তাকে সুন্দর করে তৈরি করার কৌশল আয়ত্ত করল তখনই উদ্ভব ঘটল মৃৎশিল্পের। অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মৃৎশিল্প প্রবন্ধে লিখেছেন মানুষের শিল্পের প্রথম নিদর্শন হল মাটির পাত্র, মৃৎশিল্প – 'কুমোর সজ্জা'। মাটিই হল মৃৎশিল্পের প্রধান উপকরণ। এই উপকরণ দ্বারা তৈরি যে কোনো বিষয়বস্তু মৃৎশিল্পের মধ্যেই পড়ে। অনুকূল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে বিকশিত হয় মৃৎশিল্প (ঘোষ, ১৩৮৬)। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে মৃৎশিল্পের বিকাশ বা ব্যাপ্তি একান্তভাবে অনুকূল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল (ঘোষ, ২০০২)। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবশ্য এর স্বতন্ত্র ধারা লক্ষ্য করা যায়। লোকায়ত শিল্পের একটি ধারা প্রকাশিত হয় মৃৎশিল্পের মাধ্যমে বিশেষ করে নদীর পলি বাহিত অঞ্চলে। বঙ্গদেশ নদীমাতৃক হওয়ার ফলে এখানে কুম্ভকারদের মৃৎশিল্পের চলন দেখা যায় বহু যুগ ধরেই (ঘোষ, ২০০২)।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মূলত দুই ধরনের মৃৎশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় (চট্টোপাধ্যায়, ২০০৪)। এক, আগুনে পোড়ানো মৃৎশিল্প অর্থাৎ টেরাকোটা এবং দুই, সূর্যালোকে শুকনো করা মৃৎশিল্প অর্থাৎ কাঁচামাটির শিল্প বা ক্লে আর্ট। মেহেরগড় ও সিন্ধু সভ্যতায় আবিষ্কৃত বিভিন্ন মৃৎশিল্পের নিদর্শনগুলি থেকে বোঝা যায় যে আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে মানুষ মৃৎশিল্প তৈরি করার কৌশল আয়ত্ত করতে শিখেছিল (চক্রবর্তী, ২০১৫)। মৌর্য, শুঙ্গ, কুষান, গুপ্ত, পাল, সেন প্রভৃতি যুগেও প্রবহমান ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন এক সাংস্কৃতিক ধারার অংশ হল এই মৃৎশিল্প। ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর হল এইরূপ একটি মৃৎশিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

মৃৎশিল্পের আঙ্গিকে কৃষ্ণনগর : ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পূর্ব সীমান্তবর্তী প্রেসিডেন্সি বিভাগের এবং বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী নদিয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগর হল মৃৎশিল্পের একটি অন্যতম প্রধান পীঠস্থান। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে ভবানন্দ মজুমদার মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গির কর্তৃক প্রদত্ত সনদ সূত্রে নদিয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেন এবং ১৬০৬-১৬২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন (ঘোষ, ২০০৩)। পরবর্তী কালে নদিয়ারাজ রুদ্র রায় তার রাজধানী স্থাপন করেন রেউই গ্রামে, এই রেউই হল আধুনিক কালের কৃষ্ণনগর শহর। নদিয়া রাজবংশের বিখ্যাত রাজা হলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮২ খ্রিস্টাব্দ), তিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে রাজভার গ্রহণ করে ১৭২৮-১৭৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্য সীমা ছিল উত্তরে মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণে গঙ্গাসাগর, পূর্বে ধুলিয়াপুর, এবং পশ্চিমে ভাগীরথী। সেই সময় এই রাজ্যের আয়তন ছিল ৩৮৫০ বর্গক্রোশ অর্থাৎ ১৫,৪০০ বর্গমাইল। বর্তমানে এই বৃহৎ রাজ্যের অংশ নদিয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগনা ও বাংলাদেশের যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত। নবাবী শাসনের পর সরকারি কাজে সুবিধার জন্য ব্রিটিশদের শাসনকালে নদিয়া জেলা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে। এই জেলা সর্বশেষ খন্ডিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে (বন্দোপাধ্যায়, ২০০৩)।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 459 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive



১৯৪৭ সালের পর নদিয়া জেলার মানচিত্র। যার উত্তরে রয়েছে মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণে রয়েছে চব্বিশ পরগনা, পূর্বে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে বর্ধমান (গৌতম পাল, পশ্চিমবঙ্গ জার্নাল এর সৌজন্যে)

কৃষ্ণনগরে মৃৎশিল্পের ইতিহাস : নদিয়ার সদর শহর কৃষ্ণনগর শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা রাঘব রায় কর্তৃক। ঘূর্ণী কৃষ্ণনগরের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হলেও মৃৎশিল্পের কেন্দ্র হিসাবে তখনও তা আত্মপ্রকাশ করে উঠতে পারেনি। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে অর্থাৎ লর্ড ক্লাইভের ভারতে আগমনের সময় এই ঘূর্ণী মৃৎশিল্পের এক প্রধান কেন্দ্রে পরিনত হয় (পাল, ১৪০৪)। কথিত আছে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাংলাদেশের নাটোর থেকে দুজন মৃৎশিল্পীকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে আসেন এবং সেখানে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। নদিয়ারাজ সেই কুম্ভকারদের নানান সময়ে উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তবে সেই শিল্পীরা নাটোরে থাকার সময় কি ধরনের মৃৎশিল্প চর্চা করত সে সম্পর্কে কিছু নিশ্চিতভাবে জানা যায়না। মহারাজা কুম্ভকারদের কাছে নানা দেব-দেবীর মূর্তির ছবি দেখিয়ে সেগুলির মৃণ্ময় মূর্তি তৈরি করার নির্দেশ দিতেন। কালক্রমে কুম্ভকাররা ওইসব মূর্তি নিপুনভাবে তৈরি করার দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন করলেন। আসলে নদিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মূর্তি পূজা প্রচলিত হওয়ায় উক্ত কুম্ভকারদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রবল উন্নতি ঘটেছিল। নদিয়া রাজবংশ শাক্ত হওয়ার ফলে সেইসময় মূর্তি পূজার প্রচলন সচরাচর বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই মূর্তি তৈরির ধারাবাহিকতা আজও সচল। সে কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী মূর্তি থেকে আরম্ভ করে দেশ-বিদেশে পাড়ি দেওয়া এখানকার শিল্পীদের তৈরি দুর্গা, কালী, সরস্বতী, গণেশ, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্তি হোক কিংবা শিল্পীদের তৈরি করা বিভিন্ন মডেল বা ভাস্কর্য। কৃষ্ণনগরে হেমেন পালের সময় থেকে শিল্পীরা খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কিংবা চার্চ থেকে যিশুখ্রিস্ট, মাতা মেরী ও তাদের অনুচর বর্গের মূর্তি তৈরি করার বরাত পেয়েছিলেন। এই মূর্তিগুলি ক্রমাগত তৈরি করতে করতে শিল্পীরা একটা নতুন ঘরানা বা শৈলীর উদ্ভব ঘটালেন। এটি হল খ্রিষ্টীয় মূর্তি তৈরির ঘরানা। একে ধর্মীয় মৃৎশিল্পের ধারা বলা যেতে পারে। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের ব্যাপ্তিতে প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের পাদ্রিদের ভূমিকা তাই উল্লেখযোগ্য।

দুর্গাদাস মজুমদার তাঁর ‘ওয়েস্টবেঙ্গল ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স’ গ্রন্থে জানিয়েছেন যে কৃষ্ণনগরে নিয়ে এসে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। কৃষ্ণনগরের রাজারা বিভিন্ন পূজা, মেলার প্রচলন করার মধ্য দিয়ে এখানকার মৃৎশিল্পীদের উৎসাহিত ও প্রসারলাভে সহায়তা করেছিলেন। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের কাছে কৃষ্ণচন্দ্রের থেকে পাওয়া কোনও পুরস্কার বা উপহারের চিহ্ন পাওয়া যায় না, হতে পারে নদিয়ারাজ শিল্পীদের নগদ অর্থ দিয়ে তাঁদের সাহায্য বা উৎসাহিত করতেন (চক্রবর্তী, ২০১৫)। বিখ্যাত শিল্পী যদুনাথ পাল নিজের উপার্জিত অর্থে জমি কিনে সেই জমিতে গৃহ নির্মাণ করেছিলেন; এছাড়াও কার্তিকচন্দ্র পাল, গোপেশ্বর পাল এই রকম জমি কিনে বাড়ি তৈরি করেছিলেন বলে যানা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 459 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যায়। সম্ভবত হাতির দাঁতের তৈরি শিল্পবস্তু বা মডেল থেকে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের প্রচলন হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে রাজবাড়িতে যে অভিনব দুর্গামূর্তির পুজো হয়ে আসছে তার একটি অনুরূপ হাতির দাঁতের তৈরি মডেল আছে রাজপরিবারের কাছে (চক্রবর্তী, ২০১৪)। বিভিন্ন পুজো, মেলার জন্য মূর্তি নির্মাণ করা হলেও তা সারা বছর বিক্রি হত না, এমতবস্থায় আরো নতুন কিছু করার তাগিদে চারপাশের প্রাকৃতিক সজীব চলমান মডেলকে নিপুণভাবে অনুকরণ করে তাঁরা বাস্তবানুগ শিল্পে উত্তরণ ঘটান। এমনই সময় বিদেশী শিল্প রসিকদের নজরে আসে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের সূক্ষ্ম বাস্তবতাবোধ। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প মূলত ধর্মীয় এবং বাস্তবধর্মী আদর্শে অনুপ্রানিত। ধর্মীয় মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রগুলি হল যথাক্রমেঃ ষষ্টিতলা, আনন্দময়ীতলা, রথতলা, শক্তিনগর প্রভৃতি আর বাস্তবধর্মী মৃৎশিল্প কেন্দ্রটি মূলত ঘূর্ণী কেন্দ্রিক। ঘূর্ণী হল কৃষ্ণনগরের পরম্পরাগত মৃৎশিল্পের জন্য বিশ্ব বিখ্যাত (ঘোষ,১৯৮৬)। 'ঘূর্ণীর পুতুলের দোকান ছিল বিস্ময়ের খনি' (বিশ্বাস, ২০১৫)। দুটি ক্ষেত্রের শিল্পীদের মধ্যে অবশ্য কাজের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের পরিপোষক প্রথমে ছিল সামন্ততন্ত্র এবং পরে ইংরেজ শিল্পরসিকগন। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে শিল্পীরা পেয়েছিল উৎসাহ ও উদ্দীপনা। শিল্পীরা তাঁদের নিজেদের মধ্যে এক সুষ্ঠ প্রতিযোগিতা শুরু করার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের ঘরানাকে এগিয়ে নিয়ে যান। উপযুক্ত পরিতোষিক এবং স্বীকৃতি তাঁদের কাজের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। বিশ্বের দরবারে কৃষ্ণনগরের এই মৃৎশিল্পকে পরিচিত করে দেওয়ার জন্য ইংরেজ সাহেবদের অবদান ছিল যথেষ্ট।



বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত জনৈক ব্যক্তির ছবি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর তার অনুকরণ করে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীর গড়া মডেল (সুধীর চক্রবর্তী, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ গ্রন্থের সৌজন্যে)

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পে বিদেশী পৃষ্ঠপোষকতা : শিল্পীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও খ্যাতি লাভের আশা তথা সরকারি কাজের বরাত পাওয়ার অভিলাষ এবং তার থেকে অর্থনৈতিক উন্নতির তাগিদ এই শিল্পের প্রগতি ঘটিয়েছিল। এক্ষেত্রে ভারতীয় সংগ্রহশালার অধিকর্তা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি কর্মসূত্রে এডওয়ার্ড বাকের সহকারী ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন এই শিল্পের শুভানুধ্যায়ী। তাঁর দ্বারাই কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের অনেকে ব্রিটিশ আমলাবর্গ ও ব্রিটিশ শিল্প রসিকদের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। এমনও জানা যায় শিল্পী যদুনাথ পাল একসময় ভারতীয় সংগ্রহালয়ে কাজও করেছিলেন। তৎকালীন ভারত সরকারের কৃষি ও রাজস্ব সচিব ই. সি.বাক ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে যদুনাথ পালের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন 'হিস স্পেসিমেন্স ইন ক্যালকাটা মিউজিয়াম এটসেটেরা, আর ভেরি ক্লেভার। হি ইস সো গুড দ্যট আই হোপ হি মে কন্টিনিউ টু রিসিভ অফিসিয়াল এনকারেজমেন্ট' (মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৪)।

শিল্পী রাখালদাস পালের মৃৎশিল্প আসামের চা বাগিচা ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ক্রয় করা হয়েছিল ১২০০ টাকা দিয়ে। অর্থাৎ কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প এতটাই নিখুঁত ও সূক্ষ্ম ছিল যে শিল্পীদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে ইংরেজরা কার্পন্য করেনি। এ প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন 'রাখালদাস পাল ইস দ্য বেস্ট আর্টিস্ট ইন মিনিয়েচর সেন্স, বাট হি চার্জেস এ ভেরি হাই প্রাইস' (মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৪)। মৃৎশিল্প সংগ্রহ করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন ব্রিটিশ প্রশাসক জর্জ ওয়াট।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 459 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এছাড়াও মন্মথ বাবু (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট), এস দাস অ্যান্ড কোম্পানি (লয়্যাল স্ট্রিট, ঢাকা), অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি (বেঙ্গল হোম ইন্ড্রাস্টিজ) প্রমুখ ব্যক্তি ও সংস্থা থেকে আরম্ভ করে মিশনারি ও ইংরেজরা অকৃপণ ভাবে কৃষ্ণনগরের এইসব বিভিন্ন মাটির কাজ ক্রয় করেছিলেন। এইভাবে বিপণনের ফলে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের খ্যাতি ও যশ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশদের বরাত শিল্পীদের কাছে যে অধিক পরিমাণে আসত তার প্রমান হিসাবে রাখালদাসের একটি চিঠির কথা বলা যেতে পারে। যেখানে তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা ক্যাটালগ নির্দিষ্ট জিনিস তৈরি করে ইংরেজ সাহেবদের বরাত মতো তা সরবরাহ করেই পেরে উঠতে পারি না' (চক্রবর্তী, ১৯৮৫)। অর্থাৎ বিপুল পরিমাণে এই শিল্পের চাহিদা ছিল ইংরেজ মহলে। ইংরেজরা ছিলেন কৃষ্ণনগর শৈলীর সবচেয়ে বড় সমঝদার এবং উপভোক্তা।




শিল্পী শ্রীরাম পালের পাওয়া আন্তর্জাতিক পদকের আলোকচিত্র (সুধীর চক্রবর্তী, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ গ্রন্থের সৌজন্যে)

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও শিল্পীরা রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা কতটা অর্জন করতে পেরেছিলেন তা নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা না গেলেও শিল্পীরা যে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছিল তা বলা যায়। কলকাতার মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক তথা অধ্যাপক ও'শানেশির সুনজরে পড়েছিলেন নবকুমার পাল। তিনি মাটির মূর্তি নির্মাণে এতটাই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে তাঁর তৈরি মৃন্ময় মূর্তিসমূহ ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেগুলির অনুকরণে পাথরের মূর্তি তৈরি করার উদ্দেশ্যে। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ শিল্পী জে.সি.লাও নবকুমার পালের তৈরি করা ডঃ উইলিয়াম কেরির মূর্তি দেখে তিনি কেরির আর একটি মূর্তি তৈরি করেছিলেন। লন্ডনের সোসাইটি অফ আর্টসের পক্ষ থেকে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে ওই মূর্তিটি প্রদর্শীত হওয়ার পর নবকুমার পালকে রূপোর মেডেল দ্বারা সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। ব্রিটিশ প্রশাসক চার্লস আর্চারের (১৮৬১ - ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) উদ্যোগে লন্ডনে একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শণী অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে 'একজিবিশন অফ দি অয়ার্কস অফ ইন্ড্রাস্টি অফ অল নেশনস' নামক এই প্রদর্শনীতে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। সেখানে কৃষ্ণনগরের শিল্পী শ্রীরাম পাল এর প্রেরিত শিল্পবস্তুর জন্য তিনি আন্তর্জাতিক সম্মান ও পদক লাভ করে নিজের ও কৃষ্ণনগরের নাম উজ্জ্বল করেন বিশ্ব দরবারে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে আয়োজিত 'এক্সপোজিসন ইউনিভার্সেলে দ্য প্যারিস' নামক প্রদর্শনীতে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী শ্রীরাম পাল খ্যাতি অর্জন করেন। উল্লেখ্য নবকুমার পাল পুরস্কৃত হয়েছিলেন মাটির মূর্তি তৈরি করার জন্য এবং শ্রীরাম পাল পুরস্কৃত হয়েছিলেন মাটির পুতুল তৈরি করার জন্য। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক্সপোজিসান ইউনিভার্সেলে, যেখানে শ্রীরাম পাল আন্তর্জাতিক জুরিবৃন্দের বিচারে দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরস্কার লাভ করতে সমর্থ হন। শ্রীরাম পালের নামে আর একটি পদক পাওয়া যায় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে। শ্রীরাম পালের পুত্র চন্দ্রভূষণ পালের লেখা থেকে জানা যায় ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের প্যারিসের প্রদর্শনী থেকে যে টাকা পাওয়া গিয়েছিল তা তাঁদের হাতে না দিয়ে তৎকালীন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট নিজের তত্ত্বাবধানে তাঁদের জন্য বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় ইংরেজ প্রশাসকরা সেইসময় কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের উন্নয়নে যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। এইভাবে মৃৎশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদেশী সাহেবরা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 459 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। মৃৎশিল্পীদের পরিবারের অনেকেই ইংরেজ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম করার পাশাপাশি মৃৎশিল্পের কাজও সমান তালে চালিয়ে গিয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় চন্দ্রভূষণ পাল অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক, জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা অফিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্টিষ্ট হিসাবে কাজ করেছিলেন। যদুনাথ পাল সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থায় যেমন— মার্টিন বার্ন কোম্পানিতে একজন মডেলার হিসাবে কাজ করেছিলেন। এছাড়া কলকাতার আর্ট স্কুলেও তিনি কাজ করেছিলেন। কথিত আছে যদুনাথ পালকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া একবার ইংল্যান্ডে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সেইসময় কালাপানি পার হওয়া ছিল শাস্ত্র ও সামাজিক অনুশাসন বিরূদ্ধ কাজ। তিনি সেই সময় বিদেশ যাওয়ার সুযোগ পেয়েও সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। যদুনাথের পুত্র চারুচন্দ্র পাল পুলিশ বিভাগে কর্মরত ছিলেন।



১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের এক্সপোজিশন ইউনিভার্সেলে দ্য প্যারিস নামক একটি প্রদর্শণীতে শিল্পী যদুনাথ পালের প্রশংসাপত্রের আলোকচিত্র (সুধীর চক্রবর্তী, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ গ্রন্থের সৌজন্যে)

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ‘এক্সপোজিশন ইউনিভার্সেলে দ্য প্যারিস’ নামক আর একটি প্রদর্শনীতে শ্রীরাম পাল ও যদুনাথ পাল পুরস্কৃত হয়েছিলেন। যদুনাথ পালের শিল্পকর্মে আকৃষ্ট হয়ে নদিয়ার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট সি.সি.স্টিভেন্স ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর লিখেছিলেন যে, ‘আই হ্যভ নো যদুনাথ পাল অফ কৃষ্ণনগর ফর মোর দ্যন টুয়েন্টিসিক্স ইয়ারস। হোয়েন লর্ড নর্থব্রুক ওয়াস ভাইসরয়, হি ডিসায়ের্ড টু হ্যভ ওয়ান অফ কৃষ্ণনগর মডেলার এডুকেটেড অ্যাট দ্য ক্যালকাটা স্কুল অফ আর্ট অ্যট হিস এক্সপেন্স, অ্যান্ড আই (বিং দ্য ম্যাজিস্ট্রেট অফ নদিয়া) ওয়াস আস্কড টু সিলেক্ট এ স্যুইটেবল পার্সন। আই চুজ যদুনাথ পাল অ্যস বিং দ্য ক্লেভারেস্ট অফ দ্য মডেলারস’ (চক্রবর্তী, ১৯৮৫)। ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুক ব্রিটিশ ভারতে ১৮৭২-১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিযুক্ত থাকার সময় ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে একটি একজিবিশনের আয়োজন করা হয়। সেই ‘ক্যালকাটা ফাইন আর্ট’ নামক একজিবিশনের উদ্বোধক ছিলেন লর্ড নর্থব্রুক। সেখানে শিল্পী যদুনাথ পাল পুরস্কৃত হন। এই একজিবিশনের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন কলকাতার আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হেনরি হোভার লক। ‘সুলভ সমাচার’ পত্রিকাতে সেই খবর প্রকাশিত হয়েছিল এই ভাষায় “কৃষ্ণনগরের যদুনাথ পাল মৃণ্ময়ী প্রতিমূর্তি গঠন দ্বারা জর্জ ফিবর সাহেবের পারিতোষিক পাইয়াছেন” (চক্রবর্তী, ১৯৮৫)। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের মেলবোর্ন ইন্টারন্যশনাল একজিবিশন (মেলবোর্ন) এ গোপালচন্দ্র পাল ছাড়াও মতিলাল পাল সহ যদুনাথ পাল সম্মান ও পুরষ্কার লাভ করেন। ঘূর্ণীর আর একজন প্রতিভাবান শিল্পী হলেন মতিলাল পালের নাতি তারক পাল, যিনি তাঁর অধিকাংশ শিল্পজীবন কাটিয়েছিলেন পাতিয়ালার রাজ এস্টেটে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের কলকাতায় ‘ক্যালকাটা ইন্টারন্যশনাল একজিবিশন’-এ পুরস্কৃত হয়েছিলেন যদুনাথ পাল, মতিলাল পাল, শ্রীরাম পাল, রাখালদাস পাল। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের বস্টনের ‘ফরেন আর্ট ইন্ড্রাস্টি’ প্রদর্শনীতে চন্দ্রভূষন সম্মানিত হন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের দুটি প্রদর্শনী, যথা ‘আমস্টারডাম একজিবিশন’ (হল্যান্ড) এবং ‘ইন্টারন্যাশনাল কোলোনিয়াল একজিবিশন’ (জার্মানি) - এ শিল্পী যদুনাথ পাল পুরস্কৃত হন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের লন্ডনের ‘কোলোনিয়াল অ্যান্ড ইন্ডিয়ান একজিবিশনে’ যদুনাথ পাল, চন্দ্রভূষণ পাল, রাখালদাস পাল পুরষ্কার পেয়েছিলেন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে গ্লাসগো ইন্টারন্যাশনাল একজিবিশনে নিবারণ পাল, রাখালদাস পাল, যদুনাথ পাল, বক্রেশ্বর পাল সম্মানিত হয়েছিলেন। যদুনাথ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 459 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পাল যে নাগা, গারো, দাফলা, সাঁওতাল, মিকির প্রভৃতি সতেরোটি আদিবাসীদের মূর্তি তৈরি করেছিলেন গ্লাসগো একজিবিশনের জন্য তার কয়েকটির অনুরূপ প্রতিমূর্তি পাঠানো হয়েছিল ইম্পিরিয়াল ইন্সটিটিউট ওফ লন্ডন এবং ইউরোপের আরো কয়েকটি সংগ্রহশালায়। ভারতীয় সংগ্রহালয়ের তৎকালীন অধিকর্তা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ঘূর্ণীর মৃৎশিল্পীদের কাছ থেকে তাদের তৈরি করা বিভিন্ন মৃৎশিল্পকর্ম ক্রয় করে গ্লাসগোর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রেরণ করেছিলেন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে যেসব শিল্পকর্ম তিনি ক্রয় করেছিলেন সেইগুলির দাম ছিল এইরূপ – কালেক্টার কাছারি-২.৭৫ টাকা, তেলের ঘানি - ২৫ টাকা, গ্রামের পাঠশালা - ৫০ টাকা, দুর্গাপূজা – ১৭৫ টাকা, রথযাত্রা – ৩৬০ টাকা, চা বাগিচা – ১২০০ টাকা ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রদর্শনীগুলিতে শিল্পীরা বিশেষত শ্রীরাম পাল, চন্দ্রভূষন পাল, যদুনাথ পাল, বক্রেশ্বর পাল, মতিলাল পাল, চারুচন্দ্র পাল, রাখাল দাস প্রমুখরা প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি অর্জন করেন। সেই সময়টা ছিল কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে স্বর্নযুগ (চক্রবর্তী, ১৯৮৫)। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে আয়োজিত 'ক্যালকাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল একজিবিশন' এ যদুনাথ পালের শিল্প উচ্চতর প্রশংসা অর্জন করেছিল। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মৃৎশিল্পের এক প্রদর্শনী হয়েছিল ঘূর্ণীতে, সেখানে যদুনাথ পাল ও গোপেশ্বর পালের মৃৎশিল্প সৃষ্টির প্রতিভা দেখে লর্ড কারমাইকেল মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি এতটাই সন্তুষ্ট ছিলেন যে স্বয়ং শিল্পীর বাড়ি গিয়ে করমর্দন করে আসেন। কারমাইকেলের সহায়তায় শিল্পী গোপেশ্বর পাল সামাজিক অনুশাসনের বাইরে গিয়ে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কালাপানি পার হয়ে ইংল্যান্ডে যান। সেই বছর গোপেশ্বর পাল ওয়েম্বলীতে অনুষ্ঠিত 'ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশন'-এ যোগ দিয়ে ডিউক অফ কেনটের মূর্তি খুব সামান্য সময়ের মধ্যে তৈরি করেন, যা দেখে সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকে অবাক হয়েছিলেন। সেই ঘটনা সম্পর্কে লন্ডনের দ্য ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকা তে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ৭ জুলাই এক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যার শিরোনাম ছিল 'মিস্টার গোপেশ্বর পাল অ্যাট ওয়ার্ক ইন বেঙ্গল কোর্ট,ইন্ডিয়ান প্যাভিলিয়ন. লাইটথনিং স্কাল্পচার' - এ লেখা হয়েছিল 'জিনিয়াস বর্ন বেঙ্গল এক্সিবিটস হিস স্কিল অ্যট ওয়েম্বলে রিমার্কেবল ট্যালেন্ট ইন ক্লে মডেলিং ইস বিং শোন ইন দ্য ইন্ডিয়ান প্যাভিলীয়ন অ্যট ওয়েম্বলে বাই শ্রীযুত গোপেশ্বর পাল, হু হেইলস ফ্রম কৃষ্ণনগর ইন বেঙ্গল' (চক্রবর্তী, ১৯৮৫)। এমনকি শিল্পী গোপেশ্বর পালের বহুদিনের এক সুপ্ত বাসনা ছিল ভাস্কর্যবিদ্যা শেখার, ব্রিটিশ শিল্পরসিক এবং ব্রিটিশ রাজানুগত্যে তিনি ইতালি গিয়ে ভাস্কর্যবিদ্যা শেখার সুযোগ লাভ করেন। প্রস্তর নির্মিত ভাস্কর্যের পাশাপাশি তিনি সমান ভাবে মাটির কাজও করে চলেছিলেন। কলকাতার কুমোরটুলির দুর্গাপ্রতিমা বরাবর তিনিই গড়তেন। সম্ভবত এক চালার দুর্গাপ্রতিমা থেকে গনেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক প্রতিমাকে পৃথকভাবে উপস্থাপন করার কৌশল গোপেশ্বর পালের-ই সৃষ্টি। সেই ধারা আজও দেখা যায় বিভিন্ন দুর্গোৎসবে। পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে মাটি দিয়ে যে কোনো ব্যক্তির অবিকল মূর্তি গড়ার দক্ষতাকে ইংরেজরা কুর্নিশ জানিয়েছিল। সেই দক্ষতার মাধ্যমেই তিনি গড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী সহ আরও বহু বিখ্যাত মূর্তি। ডেইলি টেলিগ্রাম পত্রিকায় লেখা হয়েছিল 'সামওয়ান ওয়ান্ডারস ইফ দ্য স্কাল্পচার ইজ ক্যাপাবেল অফ মোল্ডিং এ বাস্ট'। ইংরেজদের এই ভবিষ্যৎ বাণী সত্যি হয়েছিল বলা যায়, কারণ পরবর্তিকালে কৃষ্ণনগরে প্রস্তর, ধাতু ইত্যাদি উপাদান দিয়ে আবক্ষ মূর্তি গড়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর করের বাড়ি সংলগ্ন পার্শবর্তী মাঠে এক মৃৎশিল্পের প্রদর্শনী হয়েছিল। সেই প্রদর্শনীতে শিল্পী বক্রেশ্বর পালের মাটি দিয়ে তৈরি এক বিশালাকৃতি গোভাগাড় প্রদর্শিত হয়েছিল। সেই শিল্প ছিল এতটাই নিখুঁত ও বাস্তব যে শকুনের দল সেখানে আসল ভাগাড় ভেবে উড়ে এসেছিল। শিল্পী বক্রেশ্বর পালের তৈরি আসল বিষয়বস্তুর অবিকল অনুকরণের নৈপুন্যতা দেখে লর্ড লিটন অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন (চক্রবর্তী, ১৯৮৫)।

রঘুনাথ পালের তৈরি মডেল আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী যা ভারতীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ছিল। এছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মূর্তি, গোপেশ্বর পালের তৈরি রামকৃষ্ণ দেবের মূর্তি, কার্তিক চন্দ্র পালের তৈরি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মূর্তি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রভৃতি মূর্তিগুলি প্রস্তর, ধাতু ইত্যাদি উপাদান দ্বারা নির্মিত ঘূর্ণীর শিল্পীদের নিপুণতা ও দক্ষতার পরিচয় হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি ও ভাস্কর্যের নিদর্শন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কার্তিক চন্দ্র পাল তাঁর ২৫ বছর বয়সে কালিম্পঙে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে মূর্তি গড়েন তাতে আনন্দিত হয়ে কবিগুরু ১লা জৈষ্ঠ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ (১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ) লিখেছিলেন, 'কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র পাল আমার যে মূর্তি গঠন করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাঁহার দ্রুত হস্তের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। য়ুরোপ আমেরিকায় যে শিল্পীরা আমার মূর্তি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 459 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গড়িয়াছেন তাঁহারা আমাকে ক্লান্তিতে পীড়িত করিয়াছেন – ইহার হাতে সে দুঃখ পাই নাই' (বন্দোপাধ্যায়, ২০০৩)। ঘূর্ণীর শিল্পীরা মূর্তি তৈরির পাশাপাশি তাঁদের শিল্প সত্তার বহুমুখী প্রকাশ দেখিয়েছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে। যেমন শিল্পী জীবনকৃষ্ণ পাল বাংলাদেশের পাবনা জেলার হার্ডিঞ্জ ব্রীজের সংস্কারের জন্য ইংরেজদের কাছে চারটি জ্যামিতিক মাপের মডেল তৈরি করে দিয়েছিলেন। ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার শিল্পী জীবনকৃষ্ণ পালকে যে শংসাপত্র দিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল 'দিস ইস টু সার্টিফাই দ্যাট জীবনকৃষ্ণ পাল হ্যাস কন্সট্রাক্টেড ফোর ক্লে মডেলস অফ দ্য রীভার গঙ্গেস ইন দ্য ভিসিনিটি অফ দ্য হার্ডিঞ্জ ব্রীজ ডিউরিং দ্যা ইয়ার ১৯৩৩-১৯৩৬। দ্য মডেলস ওয়্যার কন্সট্রাক্টেড উইথ এক্সট্রিম অ্যাকিউরেসি অ্যান্ড ওয়্যার এক্স্যাক্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ রিভার বেড' (চক্রবর্তী, ১৯৮৫)। শিল্পীর তৈরি করা সেই মডেল দেখে তৎকালীন সেচ বিভাগ তার অনুকরণ করে তাদের পরবর্তি কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন (চক্রবর্তী, ২০১৪)।

ভারতবর্ষ দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিসমাপ্তির পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা অর্জন করলেও ভারত ও পাকিস্তান দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। কৃষ্ণনগর সহ নদিয়া জেলার অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ ও বেদনাদায়ক ঘটনা ছিল দেশবিভাগ (চৌধুরী, ২০১১)। কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে ৩ দিন পর অর্থাৎ ১৭ই আগস্ট কৃষ্ণনগর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই রাজনৈতিক অস্থিরতা কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৮৫৪ থেকে ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মৃৎশিল্পীদের কাজের ধারাবাহিক উপস্থাপন ঘটেছিল একাধিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে। সেই ধারাবাহিকতা পরবর্তিকালে কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছিল। ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর এখানকার মৃৎশিল্পের কদর করার মতো মানুষের অভাব লক্ষ্য করে বহু শিল্পী পরিবারের পরবর্তি প্রজন্ম আর মৃৎশিল্পের কাজে আগ্রহ দেখায়নি। শিল্পী বিজয়কৃষ্ণ পাল তাঁর পুত্রদের এই পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশা বা চাকরি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন (হালদার, ২০০৯)।



ঘূর্ণীতে অবস্থিত শিল্পী গৌতম পালের মৃৎশিল্পের কুম্ভশালা ও বিপণন কেন্দ্র. সৌজন্যেঃ নিজস্ব চিত্র



শিল্পী কার্তিকচন্দ্র পালের হাতে গড়া বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের ভাস্কর্যের আলোকচিত্র, সৌজন্যেঃ নিজস্ব চিত্র

মূল্যায়ন : নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে যে মৃৎপাত্রের ব্যবহার শুরু হয়েছিল তা ধীরে ধীরে উন্নীত হয় মৃৎশিল্পের পর্যায়ে। সেই মৃৎশিল্প যুগযুগান্তর ধরে প্রবাহিত হয়ে ভারতের একটি অন্যতম মৃৎশিল্প কেন্দ্র হিসাবে নতুন আঙ্গিকে দেখা দিয়েছিল কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ধারা রূপে। খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম শতকে জিউকসিস (প্রাচীন গ্রিসের একজন লোকশিল্পী) আঙ্গুরের থোকা অঙ্কন করে পাখিদের বিভ্রান্ত করেছিল। পাখিরা সেগুলি আসল আঙ্গুর ভেবে ঠোকরাতে বাধ্য হয়েছিল। এইরূপ বাস্তবিক অঙ্কন যেমন সেই সময় অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিল ঠিক তেমনই অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জনের অধিকারী কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প তার বস্তুপ্রধান রীতির জন্য। সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের শিল্প-সংস্কৃতিকে বরাবর সুনজরে দেখেছিলেন। পরাধীন ভারতে ইংরেজদের সক্রিয় সহায়তায় কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছিল। এর বলিষ্ঠ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 459 - 467
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রমান হিসাবে বলা যায় ইংরেজদের তৎপরতায় ও প্রেরণায় কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও শিল্পীরা ধারাবাহিক ভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসা থেকে পুরস্কার ও সম্মান অর্জন করেছিলেন। ইংরেজ আমলের পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে সরকারি অনুদানের অভাব থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে তাঁদের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছেন। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আবক্ষ মূর্তি, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে প্রতিমা, বিভিন্ন মেলা যেমন বারদোলের মেলা, রথের মেলা, চড়কের মেলা, গৃহসজ্জার অনুষঙ্গ ছাড়াও গহনা হিসাবে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের ব্যবহার আজও সচল। আশা করা যায় আগামি দিনেও এই শতাব্দী প্রাচীন মৃৎশিল্পের গরিমা অক্ষুণ্ণ থাকবে মানব সমাজের শিল্প সাংস্কৃতিক জীবনে।

Bibliography:

অরুণিমা রায়চৌধুরী, প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ প্রস্তর যুগ থেকে লৌহ যুগ, কলকাতা : মিত্রম, ২০০৮, পৃ. ৪২
অলোককুমার চক্রবর্তী, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলকাতা : গ্রন্থমিত্র, ১৯৮৯, পৃ. ২৮২-২৮৩
আকুলানন্দ বন্দোপাধ্যায়, ‘লোকশিল্প’, জেলা সংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ নদিয়া, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৩, পৃ. ১৭৩-১৮১
কুমুদনাথ মল্লিক, নদিয়া কাহিনী, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৭১-৩৭৭
গৌতম পাল, ‘কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্যের কথা’, পশ্চিমবঙ্গ নদিয়া জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৩-১৮৬
তেসলিম চৌধুরী, ভারতের ইতিহাস : আধুনিক যুগ ১৭০৭-১৯৬৪, কলকাতা : মিত্রম, ২০১১
দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ (প্রথম খন্ড), কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
দীপঙ্কর ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের মৃৎশিল্প, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ :পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০২, পৃ. ১-১৮
নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৩৬
বিনয় ঘোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ১৩৮৬, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯১
বিধান বিশ্বাস, বাংলার মাটির পুতুল, বাঁকুড়া : টেরাকটা, ২০১৫, পৃ. ৭
বিদ্যুৎ হালদার, ‘কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের সদর–অন্দর’, জীবনকুচি বিশেষ শিল্পকলা সংখ্যা, দ্বাদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯, নদিয়া : কৃষ্ণনগর, পৃ. ৫-১৫
সুধীর চক্রবর্তী, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ, কলকাতা : কে পি বাগচি এ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৫, পৃ. ২২-৫৭
সুধীর চক্রবর্তী, ‘ঘূর্ণীর মৃৎশিল্পের সেকাল ও একাল’, রাজা রাঘব রায়ের কৃষ্ণনগর, (সম্পা. অসিতকুমার সাহা, নুপূর সাহা), কৃষ্ণনগর : মহামায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কশ, ২০১৪, পৃ. ৯৭-১০৫
সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস প্রথম খন্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৪
Sankar Prasad Ghosh, Terracotta of Bengal : with special reference to Nadia, Delhi : B.R.Publishing Corporation, 1986, p. 17-22
Trailokya Nath Mukherjee, Art Manufactures of India : specially compiled for the glasgo international exhibition, 1888, New Delhi : Navyug Publication, 1974
ভাস্কর বিশ্বাস, ৬৫, অবসর প্রাপ্তন স্কুল ইন্সপেক্টর, স্নাতকোত্তর, ১২ নম্বর এল এম ঘোষ স্ট্রিট, পোস্টঅফিস ঘূর্ণী, কৃষ্ণনগর নদিয়া, পিন নম্বর-৭৪১১০৩, ঘূর্ণী, ২৬.০৭.২০২৬
কমল কৃষ্ণ পাল, ৫০, মৃৎশিল্পী, স্নাতক, কৃষ্ণনগর নদিয়া, পিন নম্বর- ৭৪১১০৩, ঘূর্ণী, ১৬.০৭.২০২৬, ২৬.০৭.২০২৬
উদয় পাল, ৫২, মৃৎশিল্পী, উচ্চমাধ্যমিক, ২৮-আজাদ হিন্দ সড়ক, ঘূর্ণী, কৃষ্ণনগর নদিয়া, পিন নম্বর - ৭৪১১০৩, ঘূর্ণী, ১৬.০৭.২০২৬, ২৬.০৭.২০২৬